গবেষণা সিরিজ-২৭

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী

'মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত' তথ্যটির

প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা

প্রফেসর ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান
FRCS (Glasgow)

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী

'মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্বনির্ধারিত' তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা

প্রফেসর ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান

F.R.C.S (Glasgow)

জেনারেল ও ল্যাপারোসকপিক সার্জন

প্রফেসর অব সার্জারী

ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রকাশক
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
৩৬৫ নিউডিওএইচএস
রোড নং ২৮, মহাখালী
ঢাকা, বাংলাদেশ
Website: revivedislam.com
E-mail- qrf.1001@gmail.com

প্রকাশকাল
১ম প্রকাশ : জানুয়ারী ২০০৯

কম্পিউটার কম্পোজ
কিউ আর এফ

মুদ্রণ ও বাঁধাই
আল মাদানী প্রিন্টার্স এন্ড কার্টুন
চ-৫৬/১, উত্তর বাড্ডা, ঢাকা-১২১২
মোবাইল ঃ ০১৯১১৩৪৪২৬৫

মূল্য ২০.০০ টাকা

সূচীপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ডাক্তার হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ। আমি একজন ডাক্তার (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, ডাক্তারি বিষয় বাদ দিয়ে একজন ডাক্তার কেন এ বিষয়ে কলম ধরল? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার।

ছোটবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশে-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি, ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। বিলাত থেকে ফিরে এসে আমার মনে হল, জীবিকা অর্জনের জন্যে বড় বড় বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রী করেছি, এখন যদি পবিত্র কুরআন তাফসীরসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, 'ইংরেজি ভাষায় বড় বড় বই পড়ে বড় ডাক্তার হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন শরীফ) পাঠিয়েছিলাম, সেটি কি তরজমাসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেব?'

এ উপলব্ধিটি আসার পর আমি কুরআন শরীফ তাফসীরসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষা জীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বুঝার অভাবটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন শরীফ পড়তে যেয়ে দেখি, ইরাকে যে সব সাধারণ আরবী বলতাম, তার অনেক শব্দই ওখানে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন শরীফ পড়তে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে ১, ২, ৫, ১০ আয়াত বা যতটুকু পারা যায়, বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন শরীফ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে

পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি লাইনও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্যে কয়েকখানা তাফসীর দেখেছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ শেষ করতে আমার প্রায় তিন বছর সময় লাগে।

পুরো কুরআন শরীফ তথা ইসলামের প্রথম স্তরের সকল মৌলিক বিষয়সহ আরো অনেক বিষয় জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর সাধারণ মানুষের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য দেখে।

এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দিচ্ছিল। সর্বোপরি, কুরআনের এই আয়াত আমাকে লিখতে বাধ্য করল–

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَـٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

অর্থ: 'নিশ্চয়ই যারা, আল্লাহ (তাঁর) কিতাবে যা নাযিল করেছেন তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু পায়, তারা যেন পেট আগুন দিয়ে ভরে। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বললেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।'
(২,বাকারা : ১৭৪)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ বলছেন, তিনি কুরআনে যে সব বিধান নাযিল করেছেন, জানা সত্ত্বেও যারা সেগুলো বলে না বা মানুষকে জানায় না এবং এর বিনিময়ে সামান্য কিছু পায় অর্থাৎ সামান্য ক্ষতি এড়াতে তথা ছোট ওজরের কারণে এমনটি করে, তারা যেন তাদের পেট আগুনে ভরলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না (ঐ দিন এটি একটি সাংঘাতিক দুর্ভাগ্য হবে) এবং তাদের পবিত্র করা হবে না (অর্থাৎ তাদের ছোট-খাট গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের ছোট-খাট গুনাহ মাফ করে দিবেন। কিন্তু যারা কুরআন জেনে তা গোপন করবে, তাদের তা করা হবে না)। তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআন জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্যে কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে, তা থেকে বাঁচার জন্যে আমি ডাক্তার হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কিভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় সূরা আরাফের ২নং আয়াতটি আমার মনে পড়ল। আয়াতটি হচ্ছে–

كِتَابٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ

অর্থ: এটা (আল-কুরআন) একটি কিতাব। এটি তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে এ জন্যে যে, এর বক্তব্য দ্বারা তুমি মানুষকে সতর্ক করবে, ভয় দেখাবে। তাই (কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে) তোমার অন্তরে যেন কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি না আসে।

ব্যাখ্যা: কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ককারী সাধারণ মানুষের অন্তরে দুটো অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে-

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বুঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে অসামঞ্জস্যশীল বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থাকে (বিশেষ করে ২য়টিকে) এড়ানোর (Overcome) জন্যে সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে, কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা, যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্যে তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দুটো সমূলে উৎপাটন করার জন্যে আল্লাহ এই আয়াতে রাসূলের (সা.) মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন,

মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনই কুরআনের বক্তব্যকে লুকাবে না বা ঘুরিয়ে বলবে না।

কুরআনের অন্য জায়গায় (গাশিয়াহঃ ২২, নিসাঃ ৮০) আল্লাহ রাসূলকে (সা.) বলেছেন, পৃথিবীর সকল মানুষ কখনই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই তুমি কুরআনের বক্তব্য (না লুকিয়ে, না ঘুরিয়ে) মানুষের নিকট উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্যে পুলিশের ন্যায় কাজ করা তোমার কাজ নয়। কুরআনের এই সব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই, আমার কথা বা লেখনীতে কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে, না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করব।

কুরআন শরীফ পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইল না। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মেশকাত শরীফ (যেখানে সিয়াহ সিত্তার প্রায় সমস্ত হাদীস এবং তার বাইরেরও অনেক হাদীসের বর্ণনা আছে) বিস্তারিত পড়ার পর আমি লেখা আরম্ভ করি। বর্তমান লেখা আরম্ভ করি ০৫.০৫.২০০৮ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে 'কুরআনিআ' (কুরআন নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা) অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত ভাই ও বোনেরা নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি, তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রাসূল (আ.) বাদে পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের নিকট অনুরোধ, যদি এই লেখায় কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব এবং সেটি সঠিক হলে, পরবর্তী সংস্করণে তা ছাপানো হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমত কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন—এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

ইসলামী জীবন বিধানে যে কোন বিষয়ে তথ্যের আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি– আল-কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধি। পুস্তিকার জন্যে এই তিনটি উৎস থেকেই তথ্য নেয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেয়া যাক, যা কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে মাধ্যম তিনটিকে যথাযথভাবে ব্যবহারের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ-

ক. আল-কুরআন

কোন কিছু পরিচালনার মৌলিক বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হচ্ছে ঐটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দেন। লক্ষ্য করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা কোন জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা চালানোর মৌলিক বিষয়গুলো সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ইঞ্জিনিয়াররা ঐ কাজটা এ জন্যে করেন যে, ভোক্তারা যেন ঐ যন্ত্রটা চালানোর মৌলিক বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই বুদ্ধিটা ইঞ্জিনিয়াররা পেয়েছে মহান আল্লাহ থেকে। আল্লাহই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়াবলী সম্বলিত ম্যানুয়াল বা কিতাব সঙ্গে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এটা আল্লাহ এ জন্যে করেছেন যে, মানুষ যেন তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়গুলোতে ভুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহর ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল-কুরআন। আল্লাহর এটা ঠিক করা ছিল যে, রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর পর আর কোন নবী-রাসূল (আ.) দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আল-কুরআনের বিষয়গুলো যাতে রাসূল (সা.) দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর, সময়ের আবর্তে, মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোন কমবেশি না হয়ে যায়, সে জন্যে কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ও মুখস্থ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি রাসূলের (সা.) মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ কেন, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন শরীফ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে।

যে সকল বিষয়ের উপরে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে ঐ সব বিষয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হচ্ছে, সব ক'টি আয়াত

পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে (Final) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কোন বিষয়ের একটা দিক এক আয়াতে এবং আর একটা দিক অন্য আয়াতে উপস্থাপন করা হয়েছে অথবা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যেই ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাসীর প্রমুখ মনীষী বলেছেন, কুরআনের তাফসীরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে কুরআনের তাফসীর কুরআন দ্বারা করা। তবে এ পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে, একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেন অন্য আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, বিরোধী না হয়। কারণ, সূরা নিসার ৮২ নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন কুরআনে পরস্পরবিরোধী কোন কথা নেই।

আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল-কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে আমি এই পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছি।

খ. সুন্নাহ

কুরআনের বক্তব্যগুলোর বাস্তব রূপ হল রাসূল (সা.)-এর জীবনচরিত বা সুন্নাহ। তাই কুরআনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা যদি কোন বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা যায়, তবে সুন্নাহর সাহায্য নিতে হবে। সুন্নাহকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে হাদীসে। এ জন্যে হাদীসকে এই পুস্তকে তথ্যের ২য় উৎস হিসাবে ধরা হয়েছে।

হাদীসের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, কোন হাদীসের বক্তব্য যদি কুরআনের কোন বক্তব্যের বিপরীত হয়, তবে নির্দ্বিধায় সেই হাদীসটিকে মিথ্যা বা বানানো হাদীস বলে অথবা তার প্রচলিত ব্যাখ্যাকে ভুল বলে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। সে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ যতই গুণান্বিত হোক না কেন। কারণ, কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যের বিপরীত কোন কথা বা কাজ রাসূল (সা.) কোনক্রমেই বলতে বা করতে পারেন না। পক্ষান্তরে কোন হাদীসের বক্তব্য যদি কুরআনের কোন বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তবে সেই হাদীসটিকে শক্তিশালী হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। তার বর্ণনাকারীগণের মধ্যে কিছু দুর্বলতা থাকলেও।

কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করা ছাড়াও রাসূল (সা.) আরো কিছু বিষয় বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন যা কুরআনে নেই

বা সেগুলো কুরআনের কোন বক্তব্যের ব্যাখ্যা বা বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়ও নয়। এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুষঙ্গিক বিষয়।

হাদীস থেকেও কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে ঐ বিষয়ে বর্ণিত সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। আর এ পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীসের বক্তব্য দুর্বল হাদীসের বিপরীতধর্মী বক্তব্যকে রহিত (Cancel) করে দেয়।

গ. বিবেক-বুদ্ধি

আল-কুরআনের সূরা আশ-শামছের ৭ ও ৮ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন–

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔

অর্থ: শপথ মানুষের মনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে ইলহামের মাধ্যমে পাপ ও সৎ কাজের জ্ঞান দিয়েছেন। যে তাকে উৎকর্ষিত করল সে সফল হল। আর যে তাকে অবদমিত করল সে ব্যর্থ হল।

ব্যাখ্যা: এখানে প্রথমে আল্লাহ জানিয়েছেন তিনি মানুষের মনকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর বলেছেন তিনি ইলহাম তথা অতিপ্রাকৃতিকভাবে ঐ মনকে কোনটি ভুল (পাপ) এবং কোনটি সঠিক (সৎ কাজ) তা জানিয়ে দেন। এরপর বলেছেন যে ঐ মনকে উৎকর্ষিত করবে সে সফলকাম হবে এবং যে তাকে অবদমিত করবে সে ব্যর্থ হবে। মানুষের এই মনকেই বিবেক এবং বিবেক নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধিকে বিবেক-বুদ্ধি বলে। আর এই বিবেকের ব্যাপারে রাসূল (সা.) এর বক্তব্য হচ্ছে-

وَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ لِوَابِصَةَ (رض) جِئْتَ تَسْاَلُ عَنِ الْبِرِّ وَ الْاِثْمِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَجَمَعَ اَصَابِعَهُ فَضَرَبَ بِهَا صَدْرَهُ وَ قَالَ اِسْتَفْتِ نَفْسَكَ وَ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ ثَلَاثًا اَلْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ اِلَيْهِ النَّفْسُ وَ اطْمَأَنَّ اِلَيْهِ الْقَلْبُ وَ الْاِثْمُ مَا حَاكَ فِى النَّفْسِ وَ تَرَدَّدَ فِى الصَّدْرِ وَ اِنْ اَفْتَاكَ النَّاسُ.

অর্থঃ রাসূল (সা.) ওয়াবেছা (রা.) কে বললেন, তুমি কি আমার নিকট নেকি ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? সে বললোঃ হ্যাঁ। অতঃপর তিনি আংগুলগুলো একত্র করে নিজের হাত বুকে মারলেন এবং বললেন, তোমার নিজের নফস ও অন্তরের নিকট উত্তর জিজ্ঞাসা কর। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন– যে বিষয়ে তোমার নফস ও অন্তর স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে, তাই নেকি। আর পাপ হলো সেটি, যা তোমার মনে সন্দেহ-সংশয়, খুঁতখুঁত বা অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে ফতোয়া দেয়।

(আহমদ, তিরমিজি)

ব্যাখ্যাঃ হাদীসখানিতে রাসূল (স.) স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, মানুষের অন্তর তথা বিবেক যে কথা বা কাজে সায় দেয় বা স্বস্তি অনুভব করে, তা হবে ইসলামের দৃষ্টিতে নেক, সৎ, ভাল বা সিদ্ধ কথা বা কাজ। আর যে কথা বা কাজে মানুষের অন্তর সায় দেয় না বা অস্বস্তি ও খুঁতখুঁত অনুভব করে তা হবে ইসলামের দৃষ্টিতে গুনাহ, খারাপ বা নিষিদ্ধ কাজ।

তবে অন্য হাদীসে উল্লেখ আছে এবং সাধারণভাবে আমরা সকলেও জানি বিবেক পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দ্বারা পরিবর্তিত হয়। তাই বিবেক-বিরুদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করার আগে তা যেমন কুরআন-হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে তেমনই বিবেক-সিদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে অগ্রাহ্য করার আগেও তা কুরআন-হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে।

পবিত্র কুরআনে এই বিবেক-বুদ্ধিকে عَقْلٌ বলা হয়েছে। এই عَقْلٌ শব্দটিকে

আল্লাহ- اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ ، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ، لاَ يَعْقِلُوْنَ ، اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ.

ইত্যাদিভাবে মোট ৪৯ বার কুরআনে ব্যবহার করেছেন। শব্দটি তিনি ব্যবহার করেছেন প্রধানত ইসলামকে জানা ও বুঝার জন্যে কুরআন ও সুন্নাহের সঙ্গে বিবেক-বুদ্ধিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে, না হয় ঐ কাজে বিবেক-বুদ্ধি না খাটানোর দরুন তিরস্কার করার জন্যে।

বিবেক-বুদ্ধি খাটানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই আল্লাহ কুরআনে শব্দটি এতবার উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া এটিকে আল্লাহ কী পরিমাণ

গুরুত্ব দিয়েছেন, তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝা যায় নিম্নের ৩টি আয়াতের মাধ্যমে–

১. সূরা আনফালের ২২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জন্তু হচ্ছে সেই সব বধির-বোবা লোক, যারা বিবেক -বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না।

২. সূরা ইউনুস-এর ১০০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

অর্থ: যারা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে কাজ করে না, তিনি তাদের উপর অপবিত্রতা বা অকল্যাণ চাপিয়ে দেন।

৩. সূরা মুলকের ১০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন:

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ

অর্থ: জাহান্নামীরা আরো বলবে, যদি আমরা (নবী-রাসূলদের) কথা শুনতাম এবং বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে তা বুঝতাম, তাহলে আজ আমাদের দোযখের বাসিন্দা হতে হত না।

ব্যাখ্যা: আয়াতটিতে দোযখের অধিবাসীরা অনুশোচনা করে যে কথা বলবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে, 'আমরা যদি পৃথিবীতে নবী-রাসূলদের তথা কুরআন ও হাদীসের কথা শুনতাম ও তা বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝার চেষ্টা করতাম, তবে আজ আমাদের দোযখের বাসিন্দা হতে হতো না।' কারণ বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে কুরআন ও হাদীসের কথা বুঝার চেষ্টা করলে তারা সহজেই বুঝতে পারত যে, কুরআন ও হাদীসের (প্রায় সব) কথা বিবেক-বুদ্ধিসম্মত। ফলে তারা তা সহজে মেনে নিতে ও অনুসরণ করতে পারত। আর তাহলে তাদের দোযখে আসতে হত না। আয়াতটি থেকে বুঝা যায়, কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে না বুঝা দোযখে যাওয়ার একটা প্রাথমিক কারণ হবে।

সুধী পাঠক, চিন্তা করে দেখুন, কুরআনের তথা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগানো এবং চিন্তা-গবেষণা করাকে আল্লাহ কী অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এই বিবেক-বুদ্ধি ও

চিন্তা-গবেষণার ব্যবহারকে তিনি কোন বিশেষ যুগের মানুষের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেননি। কারণ, মানব সভ্যতার অগ্রগতির (Development) সঙ্গে সঙ্গে কুরআনের কোন কোন আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা নতুন তথ্যসমৃদ্ধ হয়ে মানুষের নিকট আরো পরিষ্কার হয়ে ধরা দিবে। এ কথাই রাসূল (সা.) তাঁর দুটো হাদীসের মাধ্যমে এভাবে বর্ণনা করেছেন। প্রথম হাদীসটি অনেক বড়, তাই সংক্ষেপে তা উপস্থাপন করা হল-

১. হযরত আবু বকরা (রা.) বলেন, নবী করিম (সা.) ১০ জিলহজ্জ কুরবানির দিনে আমাদের এক ভাষণ দিলেন এবং বললেন, বলো, আমি কি তোমাদিগকে আল্লাহর নির্দেশ পৌঁছাই নাই? আমরা বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ। তখন তিনি বললেন, 'হে খোদা, তুমি সাক্ষী থাক।' অতঃপর বললেন, 'উপস্থিত প্রত্যেকে যেন অনুপস্থিতকে এ কথা পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা, পরে পৌঁছানো ব্যক্তিদের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি আছে, যে আসল শ্রোতা অপেক্ষাও এর পক্ষে অধিক উপলব্ধিকারী ও রক্ষাকারী হতে পারে'।
(বুখারী ও মুসলিম)
হাদীসটির 'কেননা' শব্দের আগের অংশটুকু বহুল প্রচারিত কিন্তু 'কেননা'র পরের অংশটুকু যে কোন কারণেই হোক একেবারেই প্রচার পায় নাই।

২. 'আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার বাণী শ্রবণ করেছে, তা স্মরণ ও সংরক্ষণ করেছে এবং অন্যদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। জ্ঞানের অনেক বাহক নিজে জ্ঞানী নয়। আবার জ্ঞানের অনেক বাহক নিজের চেয়ে অধিক জ্ঞানীর কাছে তা পৌঁছে দেয়'।
(তিরমিজি, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারেমি, বায়হাকি)

মহান আল্লাহ তো কুরআনের বক্তব্যকে চোখ-কান বন্ধ করে মেনে নিতে বলতে পারতেন; কিন্তু তা না বলে তিনি উল্টো কুরআনের বক্তব্যকে বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝার ব্যাপারে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এর প্রধান কয়েকটি কারণ হচ্ছে–

ক. বিবেক-বুদ্ধি সকল মানুষের নিকট সকল সময় উপস্থিত থাকে,
খ. বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে সিদ্ধান্তে পৌঁছা যেমন সহজ তেমন তাতে সময়ও খুব কম লাগে,

গ. কোন বিষয় বিবেক-সিদ্ধ হলে তা গ্রহণ করা, মনের প্রশান্তি নিয়ে তা আমল করা এবং তার উপর দৃঢ় পদে দাঁড়িয়ে থাকা সহজ হয়,

ঘ. অল্প কিছু অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) বিষয় বাদে ইসলামে চিরন্তনভাবে বিবেক-বুদ্ধির বাইরে কোন কথা বা বিষয় নেই।

তাই, বিবেক-বুদ্ধির রায়কেও এই পুস্তিকার তথ্যের একটি মূল উৎস হিসাবে নেয়া হয়েছে। তবে বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে–

ক. আল্লাহর দেয়া বিবেক বিপরীত শিক্ষা ও পরিবেশের দ্বারা পরিবর্তিত হয়, তবে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না,

খ. সঠিক বা সম্পূরক শিক্ষা ও পরিবেশ পেলে বিবেক উৎকর্ষিত হয়ে কুরআন-হাদীসের কাছাকাছি পৌঁছে যায় কিন্তু একেবারে সমান হয় না।

গ. কুরআন বা মুতাওয়াতির হাদীসের কোন বক্তব্য যদি মানুষের বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী না বুঝা যায় তবুও তাকে সত্য বলে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করতে হবে। কারণ, কুরআনের বিষয়গুলো কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই মানুষের জ্ঞান একটি বিশেষ স্তরে না পৌঁছা পর্যন্ত কুরআনের কোন কোন আয়াতের সঠিক অর্থ বুঝে না-ও আসতে পারে। কয়েকটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি আরো পরিষ্কার হবে বলে আশা করি –

১. রকেটে করে গ্রহ-উপগ্রহে স্বল্প সময়ে যাওয়ার জ্ঞান আয়ত্তে আসার পর রাসূলের (সা.) মেরাজ বুঝা ও বিশ্বাস করা সহজ হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালা 'বুরাক' নামক বাহনে করে 'সিদরাতুল মুনতাহা' পর্যন্ত এবং তারপর 'রফরফ' নামক বাহনে করে আরশে আজিম পর্যন্ত, অতি স্বল্প সময়ে রাসূল (সা.) কে নিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়ে আবার দুনিয়ায় ফেরত পাঠিয়েছিলেন।

২. সূরা যিলযাল-এর ৭ ও ৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, দুনিয়াতে বিন্দু পরিমাণ ভাল কাজ করলে তা মানুষকে কিয়ামতের দিন দেখানো হবে, আবার বিন্দু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও ঐ দিন দেখানো হবে। ভিডিও রেকর্ডিং (Video Recording)-এর জ্ঞান আয়ত্তে আসার আগ পর্যন্ত মানুষের পক্ষে এই 'দেখানো' শব্দটি সঠিকভাবে বুঝা সহজ ছিল না। তাই তাফসীরেও এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা

এসেছে। কিন্তু এখন আমরা বুঝতে পারছি, মানুষের ২৪ ঘণ্টার কর্মকাণ্ড আল্লাহ তাঁর রেকর্ডিং কর্মচারী (ফেরেশতা) দিয়ে ভিডিও বা আরো উন্নতমানের রেকর্ড করে কম্পিউটার ডিস্কের (Computer disk) ন্যায় কোনকিছুতে সংরক্ষিত রাখছেন এবং এটিই শেষ বিচারের দিন 'দেখিয়ে' বিচার করা হবে।

৩. মায়ের গর্ভে মানুষের ভ্রূণের বৃদ্ধির স্তর (Developmental steps) সম্বন্ধে কুরআনের যে সকল আয়াত আছে, আগের তাফসীরকারকগণ তার সঠিক তাফসীর করতে পারেন নাই, বিজ্ঞানের উন্নতি ঐ স্তরে না পৌঁছার কারণে। কিন্তু এখন বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূণের বৃদ্ধির (Embryological development) জ্ঞান যতই মানুষের আয়ত্তে আসছে, ততই কুরআনের ঐ আয়াতের বর্ণনা করা তথ্যগুলোর সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে।

৪. কুরআনের সূরা হাদিদে বলা হয়েছে, হাদিদ অর্থাৎ লোহা বা ধাতু (Metal)-এর মধ্যে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি। এই 'প্রচণ্ড শক্তি' বলতে আগের তাফসীরকারকগণ বলেছেন তরবারি, বন্দুক, কামান ইত্যাদির শক্তি। কিন্তু এখন বুঝা যাচ্ছে, এটি হচ্ছে পরমাণু শক্তি (Atomic energy)।

বিবেক-বুদ্ধি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'পবিত্র কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন' নামক বইটিতে।

কিয়াস ও ইজমা

যে সকল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহে কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বক্তব্য নেই বা থাকা বক্তব্যের একের অধিক ব্যাখ্যা করার সুযোগ আছে, সে সকল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহের অন্য বক্তব্যেও সাথে বিবেক-বুদ্ধি মিলিয়ে সিদ্ধান্তে আসাকে কিয়াস (Deduction) বলে। আর কোন বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফলাফল এক হওয়া বা কারো কিয়াসের ব্যাপারে সকলের একমত হওয়াকে ইজমা (Concensus) বলে। তাই সহজে বুঝা যায় কিয়াস বা ইজমা ইসলামের মূল উৎস নয় বরং তা হল আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি তথা কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসা। অর্থাৎ কিয়াস ও ইজমার মধ্যে

কুরআন ও সুন্নাহের সাথে আল্লাহ প্রদত্ত তৃতীয় উৎসটি তথা বিবেক-বুদ্ধিও উপস্থিত আছে।

ইজমাকে ইসলামী জীবন বিধানের একটি দলিল হিসাবে ধরা হলেও মনে রাখতে হবে, ইজমার সিদ্ধান্ত অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এর কয়েকটি উদাহরণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মত অন্য যে কোন বিষয়েই তা হতে পারে।

সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে যে ক্রমধারা অনুযায়ী উৎসসমূহ বইটিতে ব্যবহার করা হয়েছে

যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে, মূল উৎস তিনটি অর্থাৎ কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলাটি মহান আল্লাহ সার-সংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতে। আর রাসূল (সা.)ও সুন্নাহর মাধ্যমে সে ফর্মুলাটি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ফর্মুলাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'ইসলামে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলা' নামক বইটিতে। তবে ফর্মুলাটির চলমান চিত্রটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় উপস্থাপন করা হল–

ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলার চিত্ররূপ

পড়া, শুনা, দেখা বা অনুভবের মাধ্যমে জ্ঞানের আওতায় আসা যে কোন বিষয়

↓

বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে যাচাই

↓

বিবেক-বুদ্ধির রায়কে ইসলামের রায় বলে সাময়িকভাবে গ্রহণ করা (বিবেক-সিদ্ধ হলে সঠিক এবং বিবেকের বিরুদ্ধ বা বাইরে হলে ভুল বলে সাময়িকভাবে ধরা)

↓

কুরআন দ্বারা যাচাই

মুহ্কামাত বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়

- কুরআনে পক্ষে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বক্তব্য থাকলে সাময়িক রায়কে ইসলামের রায় বলে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা
- কুরআনে বিপক্ষে প্রত্যক্ষ (পরোক্ষ নয়) বক্তব্য থাকলে সাময়িক রায়কে প্রত্যাখ্যান করে কুরআনের বক্তব্যকে ইসলামের রায় বলে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা
- কুরআনে বক্তব্য নেই বা থাকা বক্তব্যের মাধ্যমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছাতে না পারা

মুতাশাবিহাত বা অতীন্দ্রিয় বিষয়

- কুরআনে পক্ষে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বক্তব্য থাকলে সাময়িক রায়কে ইসলামের রায় হিসেবে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা
- কুরআনে বিপক্ষে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বক্তব্য থাকলে সাময়িক রায়কে প্রত্যাখ্যান করে কুরআনের বক্তব্যকে ইসলামের রায় বলে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা
- কুরআনে বক্তব্য নেই বা থাকা বক্তব্যের মাধ্যমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছাতে না পারা

↓

হাদীস দ্বারা যাচাই

- পক্ষে সহীহ হাদীসে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বক্তব্য থাকলে সাময়িক রায়কে ইসলামের রায় বলে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা
- বিপক্ষে অত্যন্ত শক্তিশালী হাদীসের প্রত্যক্ষ বক্তব্য থাকলে সাময়িক রায়কে প্রত্যাখ্যান করে হাদীসের বক্তব্যকে ইসলামের রায় বলে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা
- হাদীসে বক্তব্য নেই বা থাকা বক্তব্যের মাধ্যমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছাতে না পারা

↓

সাহাবায়ে কিরাম, পূর্ববর্তী ও বর্তমান মনীষীদের রায় পর্যালোচনা

- তাদের রায় বেশি তথ্য ও যুক্তিভিত্তিক হলে সে রায়কে সত্য বলে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা
- নিজ বিবেকের রায় অর্থাৎ সাময়িক রায় বেশি তথ্য ও যুক্তিভিত্তিক হলে সে রায়কে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা

মৃত্যুর সময় ও কারণ সমন্ধে প্রচলিত ধারণা হল- আল্লাহ প্রত্যেকের জন্যে মৃত্যুর একটি নির্দিষ্ট সময় ও কারণ ঠিক করে রেখেছেন। কোন ব্যক্তি তার জন্যে নির্দিষ্ট করে রাখা সময়ের বিন্দুমাত্র আগে বা পরে যেমন মরবে না, তেমনি তার জন্যে নির্দিষ্ট করে রাখা কারণ ব্যতীত অন্য কারণেও সে মরবে না। এ বিশ্বাসের কারণেই মানুষেরা বলে-

১.আমি জীবনের ঝুঁকিপূর্ণ কোন কাজ করতে ভয় পাই না। কারণ, আমার জন্যে আল্লাহ মৃত্যুর যে সময় ও কারণ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন তার বিন্দুমাত্রও ব্যতিক্রম হবে না।

২.ঐ কষ্টকর চিকিৎসা আমি নেব না। কারণ চিকিৎসা নিলেও আমার জন্যে নির্দিষ্ট করে রাখা সময়ে আমার মৃত্যু হবে, আর না নিলেও ঐ সময়েই আমার মৃত্যু হবে।

৩.ভয় করিস্ না হায়াত থাকলে কেউ মারতে পারবে না।

৪.ইত্যাদি।

বর্তমান প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য কুরআন হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির তথ্যের আলোকে পর্যালোচনা করে দেখা আমাদের সকলের জানা এবং প্রায় সকলের বিশ্বাস করা এই কথাগুলো সঠিক কিনা। আর সঠিক না হলে সঠিক তথ্যগুলো কী তা বের করে জাতিকে জানানো এবং এর মাধ্যমে বিশ্বের দরবারে জাতিকে তার হারানো স্থান ফিরে পেতে সহায়তা করা।

মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্বনির্ধারিত তথ্যটি বিশ্বাসের কল্যাণ

এই তথ্যটি যিনি জানেন ও বিশ্বাস করেন ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে তার সাহস বেড়ে যায়। কারণ, সে জানে তার জন্যে নির্ধারিত সময়ের আগে সে মরবে না বা কেউ তাকে মারতে পারবে না। আর ঘরে বসে থাকলেও ঐ নির্ধারিত সময়ে তার মৃত্যু হবে।

মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্বনির্ধারিত তথ্যটি বিশ্বাসের অকল্যাণ

১. মহান আল্লাহ মহাবিশ্ব চালাচ্ছেন তাঁর তৈরী একটি প্রাকৃতিক আইনের (Natural Law) অধীনে। যাকে কুরআনে তাক্বদীর বলা হয়েছে। ঐ প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী পৃথিবীর সকল ঘটনা দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। ঐ প্রাকৃতিক আইন পরিবর্তন করার ক্ষমতা

মানুষের নেই। কিন্তু আল্লাহ ইচ্ছা করলে তা পরিবর্তন করতে পারেন। তবে বিশেষ কোন প্রয়োজন ছাড়া আল্লাহ তা করেন না। তাই আল্লাহর তৈরী করে রাখা প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী স্বাভাবিকভাবে যা ঘটার কথা তাই ঘটবে, এটা ধরে নিয়ে মানুষকে সকল কাজ করার সিদ্ধান্ত নিতে ও প্রচেষ্টা চালাতে হবে। আর তা না হলে ভয়ে বা নির্ভয়ে, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, জেনে বা না জেনে যে কাজই করা হোক না কেন, যে পদ্ধতি অনুযায়ী কাজটি করা হয়েছে তার জন্যে আল্লাহর তৈরী প্রাকৃতিক আইনে যে ফল নির্ধারিত আছে তা ঘটবেই। যেমন- কেউ যদি ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, ভয়ে বা নির্ভয়ে, জেনে বা না জেনে বিষ খায় তবে তার মৃত্যু হবেই।

২. বিপদ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে আল্লাহর তৈরী প্রাকৃতিক আইনে যে বিষয় নির্দিষ্ট করা আছে, গবেষণার মাধ্যমে তা আবিষ্কার করার আগ্রহ মানুষ হারিয়ে ফেলে।

৩. মুসলিম জাতি ডাক্তারী বিদ্যায় পৃথিবীর সকল জাতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল। মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির বিশ্বাস ডাক্তারী বিদ্যায় আজ তাদের অন্য জাতির চেয়ে অনেক পিছিয়ে পড়ার ব্যাপারে বিরাট ভূমিকা রেখেছে। কারণ এ তথ্যটি তাদের গবেষণার স্পৃহা কমিয়ে দিয়েছে।

মৃত্যুর সময়ের ব্যাপারে বাস্তবতা

১. বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে মানুষের গড় আয়ু বেড়ে যাচ্ছে। এটি প্রমাণিত সত্য। মানুষের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত যে সকল বিষয় এ সময়ে পরিবর্তন হয়েছে তা হল-

ক. খাদ্য পুষ্টির উন্নতি হয়েছে

খ. রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থায় উন্নতি হয়েছে

গ. রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থায়ও উন্নতি হয়েছে

এ বাস্তব অবস্থা থেকে বুঝা যায় বিভিন্ন কারণের (Factor) উপর ভিত্তি করে মানুষের আয়ু বাড়ে বা কমে।

২. ডাক্তারী বিদ্যায় প্রতিনিয়তই দেখা যায় সময়মত যথাযথ চিকিৎসা দিতে পারলে একজন রোগী অনেকদিন জীবিত থাকে। আর তা না হলে সে অনেক আগে মারা যায়। এ বাস্তব অবস্থা থেকে বুঝা যায় বিভিন্ন কারণের উপর ভিত্তি করে মানুষের আয়ু বাড়ে বা কমে।

৩. ডাক্তারী বিদ্যা অনুযায়ী মানুষের শরীরের একক হল কোষ (Cell)। ঐ কোষের ভিতরের কার্যক্রম (Internal Activities) সাধারণত মানুষ পূর্ণবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত বাড়তে থাকে। তার পর ধীরে ধীরে কমতে থাকে এবং একদিন কোষগুলো সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে যায় তথা মৃত্যুবরণ করে। এটিকে ডাক্তারী ভাষায় কোষের বয়স বৃদ্ধিতা (Aging process) বলে। অর্থাৎ ডাক্তারী বিদ্যার এটি একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, মানুষের শরীরের কোষের রোগ-ব্যাধি ছাড়াও জীবিত থাকার একটি শেষ সীমা আছে। অন্যদিকে রোগ-ব্যাধি বা ঘটনা–দুর্ঘটনার কারণে কোষগুলো ঐ সময়ের আগে অকেজো হয়ে যেতে তথা মৃত্যুবরণ করতে পারে। বিভিন্ন কারণ বা অনুঘটকের (Factor) উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন মানুষের কোষের বয়ঃবৃদ্ধিতার নিয়মে মৃত্যুবরণের সময় বিভিন্ন। শরীরের কোষগুলো মরে গেলে মানুষটিও মরে যাবে। তাই ডাক্তারী বিদ্যা অনুযায়ী কোন রকম রোগ-ব্যাধি বা দুর্ঘটনা ছাড়াও প্রতিটি মানুষ, আল্লাহর তৈরী বয়স বৃদ্ধিতার নিয়ম অনুযায়ী তার জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে থাকা সময়ে অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে। তবে সাধারণতঃ মানুষ বয়ঃবৃদ্ধিতার নিয়ম অনুযায়ী তার জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে থাকা মৃত্যুর সময় পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। কারণ, ঐ পর্যন্ত পৌঁছতে হলে আল্লাহর তৈরী প্রাকৃতিক আইনে উপস্থিত থাকা মৃত্যু ঘটাতে পারে এমন অসংখ্য রোগ-ব্যাধি বা ঘটনা-দুর্ঘটনা থেকে যেভাবে মুক্ত থাকা বা ঐসকল কিছু ঘটলে তার সুচিকিৎসা হওয়ার যে পদ্ধতি নির্দিষ্ট আছে তা ১০০% নির্ভুলতা সহকারে পূরণ করা সাধারণতঃ সম্ভব হয় না। অর্থাৎ প্রায় সকল মানুষ বয়ঃবৃদ্ধিতার নিয়ম অনুযায়ী তার জন্যে

নির্দিষ্ট হয়ে থাকা সময়ের পূর্বে মৃত্যুবরণ করে। আর একজন মানুষ ঐসময়ের কত আগে মৃত্যুবরণ করবে তা নির্ভর করবে জীবন হরণকারী রোগ-ব্যাধি বা বিষয় দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সময় এবং তার যথাযথ চিকিৎসা হওয়া বা না হওয়ার উপর। সুতরাং মৃত্যুর সময়ের ব্যাপারে বাস্তবতা হল-

১. আল্লাহর তৈরী বয়ঃবৃদ্ধিতার নিয়ম (Aging process) অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষের জন্যে মৃত্যুর একটি সময় নির্দিষ্ট হয়ে আছে। ঐ সময় উপস্থিত হলে একজন মানুষের অবশ্যই মৃত্যু হবে। বিভিন্ন অনুঘটকের (Factor) ভিত্তিতে নির্দিষ্ট হওয়া ঐ সময় বিভিন্ন মানুষের জন্যে বিভিন্ন।
২. বয়ঃবৃদ্ধিতার নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট হয়ে থাকা মৃত্যু তথা আয়ুর শেষ সময় পর্যন্ত মানুষ সাধারণতঃ পৌঁছতে পারে না।
৩. বয়ঃবৃদ্ধিতার নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট হয়ে থাকা সময়ের কত পূর্বে একজন মানুষ মৃত্যুবরণ করবে তা নির্ভর করবে জীবন হরণকারী রোগ-ব্যাধি বা ঘটনা–দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সময় এবং তার সুচিকিৎসা হওয়া না হওয়ার উপর। আর এ সময়টিও বিভিন্ন অনুঘটকের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন মানুষের জন্যে বিভিন্ন।

মৃত্যুর সময় ও কারণের ব্যাপারে আল-কুরআন

তথ্য-১

وَاللّٰهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا ط وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ط وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ ط إِنَّ ذَٰلِكَ

عَلَى اللّٰهِ يَسِيرٌ ط

অর্থ: আল্লাহ তোমাদেরকে মাটি (মাটির মৌলিক উপাদান) হতে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর ফোঁটা সদৃশ বস্তু হতে। তারপর তোমাদের জোড়া

(পুরুষ ও নারী) বানিয়েছেন। নারীদের মধ্য থেকে কেউ গর্ভবতী হয় না এবং সন্তান প্রসব করেনা তাঁর জানা ব্যতীত। আয়ুপ্রাপ্তদের কেউ আয়ু পায় না এবং কারো আয়ু হতে কমে না, কিতাবের লেখা ব্যতীত। নিশ্চয় এটি আল্লাহর জন্যে সহজ। (৩৫,ফাতির : ১১)

ব্যাখ্যাঃ আয়াতের শেষ অংশটুকু পুস্তিকার বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাই আমরা ঐ অংশটুকু শুধু এখানে ব্যাখ্যা করবো। এ অংশের প্রথমে আল্লাহ বলেছেন- 'আয়ুপ্রাপ্তদের কেউ আয়ু পায় না এবং কারো আয়ু হতে কমে না, কিতাবের লেখা ব্যতীত'। এ অংশটুকু ইতিবাচকভাবে বললে দাঁড়াবে 'আয়ুপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা আয়ু পায় এবং কারো আয়ু হতে কিছু আয়ু কমে কিতাবের লেখা অনুযায়ী'।

তাহলে আয়াতে কারীমার এ অংশের তথ্য হচ্ছে-মানুষের আয়ুপ্রাপ্ত হওয়া এবং মানুষের আয়ু হতে আয়ু কমা, এ সকল কিছু সংঘটিত হয় কিতাবের লেখা অনুযায়ী। 'আয়ু থেকে আয়ু কমা' তথ্যটি থেকে বুঝা যায় সকল মানুষের আয়ুর তথা মৃত্যুর একটি নির্দিষ্ট শেষ সীমা আছে। ঐ সীমা থেকে মানুষের আয়ু কমে বা কমতে পারে। অর্থাৎ ঐ নির্দিষ্ট শেষ সীমার আগে মানুষের মৃত্যু হয় বা হতে পারে।

আর 'কিতাবের লেখা অনুযায়ী' তথ্যটির মাধ্যমে মহান আল্লাহ জানিয়েছেন মানুষ আয়ুপ্রাপ্ত হয় বা কারো আয়ুর নির্দিষ্ট শেষসীমা হতে আয়ু কমে, আল্লাহর তৈরী করে রাখা কিতাবে উল্লেখ থাকা নিয়ম-কানুন অনুযায়ী।

আল-কুরআনের বেশ কিছু আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, মহাবিশ্বে সংঘটিত হওয়া সকল ঘটনা-দুর্ঘটনা এবং তা সংঘটিত হওয়ার নিয়ম-কানুন, অর্থাৎ কী কী অনুঘটক (Factor) একত্রিত হলে একটি ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটবে তা উম্মুল (মূল) কিতাব নামের একটি কিতাবে তিনি লিখে রেখেছেন। ঐ কিতাবখানি সংরক্ষিত আছে লাওহে মাহফুজ নামক স্থানে।

তাহলে আয়াতে কারীমার আয়ু সম্পর্কিত অংশটুকু হতে জানা যায় মহান আল্লাহর তৈরী করা এবং লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত থাকা উম্মুল কিতাবে লেখা আছে প্রত্যেক মানুষের আয়ুর সুনির্দিষ্ট শেষ সীমা তথা

মৃত্যুর নির্দিষ্ট শেষ সীমা। ঐ শেষ সীমা কোন মানুষ কখনই বা কোনভাবে অতিক্রম করতে পারবে না। আর ঐ কিতাবে এটিও উল্লেখ আছে যে কী কী অনুঘটক (Factor) মিলিত হলে মানুষ আয়ু প্রাপ্ত হবে। অর্থাৎ ঐ কিতাবে লিখা আছে কী কী অনুঘটক মিলিত হলে মৃত্যুর নির্দিষ্ট শেষ সময়ের ভিতরে থেকে মানুষ বেশি বা কম আয়ুর অধিকারী হবে।

আয়াতে কারীমার শেষ অংশে আল্লাহ নিশ্চয়তা সহকারে বলেছেন এ কাজ আল্লাহর জন্যে সহজ। এ বক্তব্যটির মাধ্যমে আল্লাহ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, যে কোটি কোটি অনুঘটকের বিন্যাস পরিবর্তনের (Permutation combination) মাধ্যমে ঐ সকল বিষয় সংঘটিত হয়, তা নিখুঁতভাবে জানা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। ঐ অনুঘটকের মধ্যে আছে জেনেটিক ও পরিবেশগত অনুঘটক, খাদ্য, বিশ্রাম, ব্যায়াম, রোগ, চিকিৎসা, দুর্ঘটনা ইত্যাদি। তাই একজন মানুষের আয়ু বা মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট শেষ সময়টি মানুষের পক্ষে বের করা যেমন সম্ভব নয় তেমনি বের করা সম্ভব নয় মৃত্যুর শেষ সময়ের মধ্যে অবস্থিত মৃত্যুর কোটি কোটি অবস্থান। কিন্তু মহান আল্লাহর জন্যে এটি নির্ণয় করা বা জানা সহজ। কারণ, মানুষের জীবন-মৃত্যুর সাথে সম্পর্কযুক্ত কোটি কোটি অনুঘটক (Factor) সমন্ধে মহান আল্লাহর নিখুঁত জ্ঞান আছে।

তাহলে এ আয়াতের মৃত্যুর সাথে সম্পর্কিত তথ্যের সাথে বাস্তবতা তথা ডাক্তারী বিদ্যার হুবহু মিল আছে। কারণ ডাক্তারী বিদ্যা অনুযায়ীও কোন রোগ-ব্যাধি, ঘটনা-দুর্ঘটনা না ঘটলেও একজন মানুষ বয়ঃবৃদ্ধিতার প্রাকৃতিক নিয়ম (Aging process) অনুযায়ী একদিন মারা যাবে। ঐ সময়ের বেশী কোন মানুষ কোনক্রমেই বাঁচতে পারবে না। আর আয়ু কমানোর ন্যায় রোগ-ব্যাধি হলে বা দুর্ঘটনা ঘটলে এবং তার যথার্থ চিকিৎসা না হলে মৃত্যুর ঐ শেষ সময়ের আগে মানুষ মারা যাবে। আর রোগ-ব্যাধি ঘটা ও তার চিকিৎসার উপর ভিত্তি করে মৃত্যুর নির্দিষ্ট শেষ সময়ের আগে মৃত্যুর অসংখ্য অবস্থান হতে পারে। মানব সভ্যতার জ্ঞান বর্তমানে উন্নতির চরম শিখরে। কিন্তু জ্ঞানের বর্তমান স্তরেও অধিকাংশ রোগের প্রকৃত কারণটি ডাক্তারী বিদ্যা জানে না। তাই মৃত্যুর সাথে

সম্পর্কিত সকল অনুঘটক সম্পর্কে নিখুঁত জ্ঞান অর্জন করা মানব সভ্যতার পক্ষে যে কখনই সম্ভব হবে না তা নিশ্চয়তা সহকারেই বলা যায়।

তথ্য-২

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا ط وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ

অর্থ: তিনিই তোমাদেরকে মাটি (মাটির মৌলিক উপাদান) হতে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমাদের জন্যে জীবনের মেয়াদ ফয়সালা করেছেন। এটি ব্যতীত আর একটি মেয়াদও তাঁর নিকট নির্দিষ্ট আছে। এরপরেও তোমরা সন্দেহে আছো? (৬, আনআম : ২)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ্ এখানে প্রথমে বলেছেন, মানুষকে তিনি মাটির মৌলিক উপাদান তথা কার্বন, হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর বলেছেন তিনি মানুষের জন্যে জীবনের মেয়াদ ফয়সালা (সমাধান) করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ বলেছেন সকল অনুঘটক বিবেচনায় এনে তিনি মানুষের জীবনের মেয়াদের সমাধান করেছেন। আল্লাহ এখানে মেয়াদ কথাটি অনির্দিষ্টভাবে বলেছেন। তাই বলা যায় আল্লাহ এখানে বলেছেন-তিনি মানুষের জন্যে বয়ঃবৃদ্ধিতার নিয়ম অনুযায়ী বিভিন্ন অনুঘটকের ভিত্তিতে জীবনের একটি মেয়াদ এবং ঐ মেয়াদের মধ্যে বিভিন্ন অনুঘটকের (Factor) উপর ভিত্তি করে জীবনের অসংখ্য মেয়াদ নির্দিষ্ট করেছেন। আয়াতে কারীমার শেষে আল্লাহ্ বলেছেন অন্য একটি মেয়াদও তাঁর নিকট নির্দিষ্ট আছে। এ মেয়াদটি হচ্ছে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময়ের মেয়াদ। এ মেয়াদটি কত অর্থাৎ কিয়ামত কবে সংঘটিত হবে সেটিও আল্লাহ ব্যতীত আর কারো পক্ষে বলা বা বের করা সম্ভব নয়।

তথ্য-৩

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي ج مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَاالْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ط إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ -

অর্থঃ আল্লাহ মৃত্যুর সময় প্রাণকে উঠিয়ে নেন। আর যে মরে না তার নিদ্রাকালে। অতঃপর যার মৃত্যুর ফয়সালা করেন তার প্রাণকে আটকিয়ে রাখেন, আর অন্যদের প্রাণকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ফেরত পাঠিয়ে দেন। ইহাতে অবশ্যই চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে। (৩৯, যুমার ঃ ৪২)

ব্যাখ্যাঃ আল কুরআনের যে সকল স্থানে আল্লাহর ইচ্ছায় হয়, আল্লাহর আদেশে হয়, আল্লাহ ফয়সালা করেন, আল্লাহ উঠিয়ে নেন, আল্লাহ আটকিয়ে রাখেন, আল্লাহ ফেরত পাঠান ইত্যাদি কথা এসেছে তার অধিকাংশ স্থানে ঐ বিষয়গুলো অতাৎক্ষণিক ইচ্ছায় সংঘটিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। অর্থ্যাৎ ঐ বিষয়গুলো আল্লাহর তৈরী করে রাখা আইন বা নিয়ম-কানুন (প্রাকৃতিক আইন) অনুযায়ী সংঘটিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি **'কুরআন হাদীস ও বিবেক বুদ্ধি অনুযায়ী আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয় তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা'** নামক বই খানিতে। এ তথ্যগুলো সামনে রাখলে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা হবে নিম্নরূপ-

আয়াতে কারীমার প্রথমে আল্লাহ বলেছেন, তিনি মৃত্যু ও নিদ্রার সময় প্রাণকে উঠিয়ে নেন। অর্থাৎ আল্লাহর তৈরী প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী মৃত্যু ও নিদ্রার সময় প্রাণ উঠে যায়। ডাক্তারী বিদ্যা অনুযায়ী নিদ্রা হল ফিজিওলজিক্যাল মৃত্যু (Physiological death)। অর্থাৎ যে সকল বিষয় স্থায়ীভাবে লোপ পেলে মানুষের মৃত্যু হয় তার কিছু বিষয় অস্থায়ীভাবে লোপ পাওয়ার কারণে মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে। এ তথ্যটিই আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন মৃত্যু ও নিদ্রার সময় প্রাণকে উঠিয়ে নেয়া তথ্যটির মাধ্যমে।

আয়াতে কারীমায় অতঃপর আল্লাহ বলেছেন, যার জন্যে তিনি মৃত্যুর ফয়সালা বা সমাধান করেন তার প্রাণকে আটকিয়ে রাখেন আর

অন্যদের প্রাণকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ফেরত পাঠিয়ে দেন। এখানে বলা হয়েছে, তাঁর তৈরী করে রাখা প্রাকৃতিক বিধি-বিধান অনুযায়ী ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার জন্যে সে সকল অনুঘটকের (Factor) প্রয়োজন হয় তার অভাব যার মধ্যে ঘটে সে ব্যক্তির প্রাণ আর ফেরত আসে না। অর্থাৎ তার মৃত্যু ঘটে। আর যে ব্যক্তির মধ্যে ঐ অনুঘটকসমূহের অভাব হয় না সে ঘুম থেকে আবার জেগে উঠে। এভাবে ঘুমিয়ে যাওয়া ও জেগে উঠার মাধ্যমে, বয়ঃবৃদ্ধিতার নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট হয়ে থাকা আয়ুর শেষ সীমা অথবা ঐ শেষ সীমার ভিতরে বিভিন্ন অনুঘটকের সমন্বয়ে নির্দিষ্ট হয়ে থাকা আয়ুর অসংখ্য অন্তর্বর্তীকালীন সীমার দিকে একজন মানুষের জীবন অগ্রসর হতে থাকে।

ডাক্তারী বিদ্যা অনুযায়ী অনেক মানুষের ঘুমের মধ্যে মৃত্যু (Sleep death) হয়। এর কারণ হল ঘুম থেকে জাগার সময় হার্টের কাজ হঠাৎ বেড়ে যায়। যাদের হার্টের অসুখ থাকে তাদের কারো কারো হার্ট ঐ হঠাৎ চেপে বসা অধিক কাজের বোঝা বহন করতে পারে না। ফলে হার্ট অকেজো (Heart Attack) হয়ে তারা মারা যায়। আয়াতে ঘুমের সময় কারো কারো প্রাণকে আটকিয়ে রাখা কথাটির দ্বারা আল্লাহ এটিই বুঝিয়েছেন বলে মনে হয়।

তথ্য-৪

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ط ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

অর্থ: তিনি রাতের বেলায় (ঘুমের সময়) তোমাদের প্রাণকে উঠিয়ে নেন। আর দিনের বেলায় তোমরা যা কর তা জানেন। আর ঐ দিনে তোমাদের (প্রাণ ফেরত পাঠিয়ে) জাগরিত করা হয় যেন নির্দিষ্ট আয়ু পূর্ণ হতে পারে। অতঃপর তাঁর দিকেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে। অতঃপর যা তোমরা কর তা তোমাদের নিকট উপস্থাপন করা হবে।

(৬,আনআম ঃ ৬০)

ব্যাখ্যা: এ আয়াতখানিতেও ৩ নং তথ্যের আয়াতের ন্যায় ঘুমিয়ে যাওয়া ও জেগে উঠার বৃত্তের মধ্যে থেকে, বয়ঃবৃদ্ধিতার নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট হয়ে থাকা বয়সের শেষ সীমা অথবা ঐ শেষ সীমার মধ্যে বিভিন্ন

অনুঘটকের মাধ্যমে নির্দিষ্ট হয়ে থাকা আয়ুর অসংখ্য অন্তর্বর্তীকালীন সীমা পর্যন্ত মানুষের জীবন এগিয়ে যাওয়ার কথাই বলা হয়েছে।

তথ্য-৫

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ط وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ج وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ط

অর্থ: হে লোকেরা পুনরুত্থানের ব্যপারে যদি সন্দেহ হয় তবে তোমাদের জানা উচিৎ যে, আমি তোমাদেরকে মাটি (মাটির মৌলিক উপাদান) থেকে সৃষ্টি করেছি। পরে ফোঁটার আকৃতি সদৃশ বস্তু হতে, অতঃপর শক্ত করে ঝুলে থাকা আকৃতির ন্যায় বস্তু হতে, তারপর দুপাটির দাঁতের ছাপ থাকা সদৃশ বস্তু হতে, যা আকৃতিসম্পন্ন বা আকৃতিহীনও হয়। (এ কথা এ জন্যে বলা হচ্ছে) যেন তোমাদের নিকট প্রকৃত সত্য স্পষ্ট হয়। পরে আমি ভ্রূণকে স্বইচ্ছায় একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত জরায়ুর মধ্যে রাখি। পরে তোমাদের একটি শিশুরূপে ভূমিষ্ঠ করি। (তারপর তোমাদের লালন-পালন করি) যেন তোমরা যৌবন পর্যন্ত পৌঁছতে পার। আর তোমাদের মধ্যে কাউকে পূর্বাহ্নেই ডেকে পাঠানো হয়। আবার কাউকে এমন খারাপ বয়স পর্যন্ত পৌঁছানো হয় যে, সে জানার পরও সব ভুলে যায়। (২২, হজ্জ ঃ ৫)

ব্যাখ্যা: আয়াতে কারীমায় মহান আল্লাহ বলেছেন তিনি নিজ ইচ্ছায় একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ভ্রূণকে জরায়ুর মধ্যে রাখেন। তারপর ঐ ভ্রূণকে তিনি শিশুরূপে বের করে আনেন। আল্লাহর এ বক্তব্যের ব্যাখ্যা হল-আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা অনুযায়ী ভ্রূণ একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত মায়ের জরায়ুর মধ্যে থাকে। তারপর ঐ ভ্রূণ আবার আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা অনুযায়ী জরায়ু থেকে বের হয়ে এসে শিশুরূপে জন্মগ্রহণ করে।

ভ্রূণের মায়ের পেটে অবস্থান কালের ব্যাপারে ডাক্তারীবিদ্যার তথ্য হল- ভ্রূণের মায়ের জরায়ুর মধ্যে অবস্থানের সাধারণ মেয়াদ নয়

মাস দশ দিন। সাধারণত এই সময়ে মায়ের প্রসব বেদনা আরম্ভ হয় এবং বাচ্চা প্রসব হয়। তবে বিভিন্ন অনুঘটকের উপর ভিত্তি করে প্রসব বেদনা ঐ নয় মাস দশ দিনের আগে বা পরে উঠতে পারে। অন্যদিকে প্রসব বেদনা ওঠার সাধারণ সময় অতিক্রম হতে পারলেও তার একটি নির্দিষ্ট শেষসীমা আছে। ঐ সীমায় পৌঁছলে প্রসব বেদনা নিশ্চিতভাবে উঠবে। ঐ শেষ সীমাও বিভিন্ন অনুঘটকের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ভ্রূণের জন্যে বিভিন্ন। আবার সাধারণ সময়ের পূর্বে প্রসব বেদনা উঠতে পারলেও সে ওঠার সময়ও অনুঘটকের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট এবং বিভিন্ন ভ্রূণের জন্যে বিভিন্ন।

অন্যদিকে মায়ের পেটে ভ্রূণের বেঁচে থাকা বা আয়ুর বিষয়ে ডাক্তারীবিদ্যা তথা বাস্তবতার তথ্য হল- জরায়ুর মধ্যে, বিভিন্ন অনুঘটকের প্রভাবে ভ্রূণের বেঁচে থাকার একটি নির্দিষ্ট শেষসীমা আছে। যার বেশি কোন ভ্রূণ জরায়ুর মধ্যে বেঁচে থাকতে পারে না। অনুঘটকের উপর ভিত্তি করে ভ্রূণেরবেঁচে থাকার ঐ শেষ সময়ও বিভিন্ন ভ্রূণের জন্যে বিভিন্ন। আবার বেঁচে থাকার ঐ শেষ সীমার মধ্যে, বিভিন্ন অনুঘটকের ভিত্তিতে ভ্রূণ যেকোন সময়ে মারা যেতে পারে। এই সময়ও বিভিন্ন অনুঘটকের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট এবং এটিও বিভিন্ন ভ্রূণের জন্যে বিভিন্ন।

বাস্তবতা ও কুরআনের তথ্যের মাধ্যমে পূর্বে আমরা জেনেছি পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মানুষের বয়সের একটি শেষসীমা আছে, যা কোন মানুষ কোনভাবে অতিক্রম করতে পারবে না। ঐ শেষ সীমাটিও বিভিন্ন অনুঘটকের উপস্থিতির ভিত্তিতে বিভিন্ন মানুষের জন্যে বিভিন্ন। আবার ঐ শেষ সীমার আগেও মানুষ যেকোন সময়ে মারা যেতে পারে বিভিন্ন কারণে। আর ঐ সময়টিও অনুঘটকের ভিত্তিতে বিভিন্ন মানুষের জন্যে বিভিন্ন।

তাহলে কুরআন ও বাস্তবতার আলোকে দেখা যায় জরায়ুর মধ্যে ভ্রূণের জীবন তথা আয়ুর মেয়াদ, জরায়ুর মধ্যে ভ্রূণের অবস্থানের মেয়াদ এবং জরায়ুর বাইরে মানুষের জীবন বা আয়ুর মেয়াদের মধ্যে এক অপূর্ব মিল আছে।

আয়াতে কারীমার শেষে আল্লাহ বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কাউকে পূর্বাহ্নেই ডেকে পাঠানো হয় আবার কাউকে এমন বয়স পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া হয় যে, সে জানার পরেও ভুলে যায়"। আয়াতের এ অংশটুকুর ব্যাখ্যা হল– প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী জীবন হরণকারী বিষয় না ঘটা বা ঘটলেও তার যথাযথ চিকিৎসা হওয়ার ফলে সামনে অগ্রসর হয়ে কেউ কেউ যৌবন কালে পৌঁছে যায়। আবার জীবন হরণকারী বিষয় না ঘটার কারণে বা ঘটলে তার যথাযথ চিকিৎসার ফলে কেউ কেউ এমন বয়সে পৌঁছে যায় যখন বয়ঃবৃদ্ধিতার নিয়ম অনুসারে শরীরের সকল কোষের ন্যায় স্মরণশক্তির কোষগুলোও দুর্বল হয়ে যায়। তাই সে কোন বিষয় জানার পরও তাড়াতাড়ি ভুলে যায়।

তথ্য-৬

وَانفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ ان يَاتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ لا فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ ط وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٥

অর্থ: তোমাদের যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে মৃত্যু আসার পূর্বেই ব্যয় কর। অন্যথায় বলবে, 'হে আমার রব, আমাকে আরো কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি দান-সদকা করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম'। অথচ প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত মেয়াদ যখন এসে যায়, তখন আল্লাহ কাউকে অবকাশ দেন না। তোমরা যা কর আল্লাহ তার সবকিছুর খবর রাখেন। (৬৩, মুনাফিকুন ঃ ১০,১১)

ব্যাখ্যা : দান-সদকা করা একটি মৌলিক নেক আমল। তাই এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, যারা মৌলিক নেক আমল না করা তথা মৌলিক গুনাহ আমলনামায় থাকা অবস্থায় মৃত্যুর দুয়ারে উপস্থিত হবে তারা আল্লাহর নিকট কিছু সময় আয়ু প্রার্থনা করবে, যেন নেক আমল করে আসতে পারে। কিন্তু আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে জীবনের নির্ধারিত মেয়াদ যখন এসে যাবে তখন কাউকে অবকাশ দেয়া হবে না।

এ আয়াত বা এ ধরণের আয়াতের অসতর্ক ব্যাখ্যা থেকে মুসলিম সমাজে চালু রয়েছে যে, মানুষের মৃত্যুর একটি মাত্র নির্দিষ্ট সময়

আছে। ঐ সময় যখন এসে যাবে তখন কাউকে আর অবকাশ দেয়া হবে না। অর্থাৎ ঐ পূর্বনির্দিষ্ট সময়েই তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে তথা ঐ নির্দিষ্ট সময়ের এক মুহূর্ত আগে বা পরে কারো মৃত্যু হবে না। এ ব্যাখ্যা পূর্বে উল্লেখিত কুরআনের আয়াতসমূহ ও বাস্তবতার বিরুদ্ধ। তাই আয়াতের এ ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হবে না।

আয়াতখানির প্রকৃত ব্যাখ্যা হবে-আল্লাহ্ সকল অনুঘটক (Factor) বিবেচনায় এনে প্রত্যেক মানুষের আয়ুর একটি নির্দিষ্ট শেষ সীমা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। আবার মৃত্যুর নির্দিষ্ট শেষ সময়ের পূর্বে যে সকল অনুঘটকের কারণে মৃত্যু হতে পারে তাও নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। আবার ঐ সকল কারণের প্রতিকার বা চিকিৎসাও আল্লাহ্ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। মৃত্যুর নির্দিষ্ট শেষ সময়ের পূর্বে জীবন হরণকারী ঘটনা ঘটলে এবং তার চিকিৎসার জন্যে নির্দিষ্ট করে রাখা ব্যবস্থা না নিলে, মানুষ ঐ সময়ে অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে। আর যদি ঐ দুর্ঘটনা বা রোগের প্রাকৃতিক আইনে নির্দিষ্ট থাকা চিকিৎসা যথাযথভাবে করা হয় তবে জীবন চলতে থাকবে তথা জীবন নির্দিষ্ট শেষ সীমার দিকে অগ্রসর হতে থাকবে।

তথ্য-৭

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا ط وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٥

অর্থ: তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি (মাটির মৌলিক উপাদান) হতে, অতঃপর ফোঁটা হতে, অতঃপর ঝুলে থাকা বস্তু হতে। অতঃপর তোমাদের শিশুরূপে (মায়ের পেট হতে) বের করেন। অতঃপর (জীবন এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়) যৌবন ও পরে বার্ধক্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এর পূর্বে মৃত্যুবরণ করে। (আর এ সব স্তরের মাধ্যমে) জীবনের নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আবার (এ সকল তথ্যের মাধ্যমে) তোমরা যেন জীবন-মৃত্যুর প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করতে পার তারও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(৪০, মুমিন ঃ ৬৭)

ব্যাখ্যা: আয়াতে কারীমার শেষে আল্লাহ বলেছেন আয়াতে উপস্থিত তথ্যের মাধ্যমে মানুষ যাতে জীবন-মৃত্যু বা আয়ুর প্রকৃত অবস্থা বুঝতে

পারে তার ব্যবস্থা তিনি করেছেন। আয়াতে কারীমায় জীবন-মৃত্যু বা আয়ু সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তার ব্যাখ্যা হল- মায়ের পেট থেকে শিশুরূপে বের হওয়ার পর মানুষের জীবন এগিয়ে যেতে থাকে। কেউ কেউ জীবন হরণকারী বিষয় না ঘটা বা ঘটলেও তার যথাযথ চিকিৎসার কারণে যৌবন কালে পৌঁছে যায়। আবার কেউ কেউ জীবন হরণকারী বিষয় না ঘটা বা ঘটলে তার চিকিৎসার মাধ্যমে বার্ধক্যকালে পৌঁছে যায়। অন্যদিকে জীবন হরণকারী বিষয় ঘটা বা তার সুচিকিৎসা না হওয়ার কারণে কারো কারো আগেই মৃত্যু ঘটে। আর এভাবে জীবনের বিভিন্ন বাঁক বা স্তর অতিক্রম করতে পারা বা না পারার মাধ্যমে একজন মানুষ আল্লাহর তৈরী করে রাখা প্রাকৃতিক আইনে নির্দিষ্ট হয়ে থাকা কোন এক স্তরে বা সময়ে মৃত্যুবরণ করে।

তথ্য-৮

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ط وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ط

অর্থ : প্রত্যেক ব্যক্তিকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। এবং তোমরা সকলে কিয়ামতের দিন নিজ প্রতিফল পুরোপুরিভাবে পাবে।

(৩,আলে ইমরান ঃ ১৮৫)

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ এখানে জীবনের সাথে সম্পর্কিত এমন একটি কথা বলে দিয়েছেন যে বিষয়ে পৃথিবীর কোন মানুষের দ্বিমত করার সুযোগ নেই। কথাটি হল সকল মানুষকে একদিন মরতে হবে। অর্থ্যাৎ 'জন্মিলেই মরিতে হইবে'। কিন্তু তিনি এখানে মৃত্যুর সময়কে অনির্দিষ্ট রেখেছেন। কারণ জীবন হরণকারী বিষয় ঘটা না ঘটা এবং ঘটলে তার সুচিকিৎসা হওয়া বা না হওয়ার উপর ভিত্তি করে মৃত্যুর অসংখ্য অবস্থান হতে পারে।

তথ্য-৯

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ط فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ o

অর্থ:প্রত্যেক জাতির স্থায়িত্বের নির্দিষ্ট মেয়াদ আছে। যখন সে মেয়াদ এসে যায় তখন এক মুহূর্তের জন্যেও তা আর পরিবর্তন করা হয় না।

(৭, আরাফ ঃ ৩৪)

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বোল্লিখিত সকল আয়াতে أَجَلٌ শব্দটি দ্বারা ব্যক্তির জীবনের বা আয়ুর স্থায়িত্ব বুঝানো হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে ঐ শব্দটি দ্বারা জাতির স্থায়ীত্ব বুঝানো হয়েছে।

আল্লাহ এখানে বলেছেন, প্রত্যেক জাতির স্থায়ীত্বের একটি মেয়াদ নির্দিষ্ট আছে। যখন ঐ মেয়াদ এসে যায় তখন তা আর বাড়ে না বা কমে না। অর্থাৎ মেয়াদে পৌঁছে গেলে একটি জাতির অবলুপ্তি ঘটে।

পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক জাতির উত্থান ও পতন হয়েছে। পর্যালোচনা করলে দেখা যায় উত্থান-পতনের মেয়াদ বিভিন্ন জাতির বেলায় বিভিন্ন ছিল। এখান থেকে বুঝা যায়, একটি জাতির উত্থান-পতনও আল্লাহর নির্দিষ্ট করা বিভিন্ন অনুঘটকের (Factor) সংমিশ্রণের উপর নির্ভর করে। অনুঘটকের পরিবর্তনের কারণে ঐ মেয়াদ পরিবর্তন হয় তথা বাড়ে বা কমে। জাতি বিলুপ্ত হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ কতৃক নির্দিষ্ট অনুঘটকসমূহের মিশ্রণ একটি জাতির জীবনের যে স্তরে ঘটে সে স্তরেই ঐ জাতি বিলুপ্ত হয়।

তাহলে দেখা যায় যে, ব্যক্তির জীবন বিলুপ্ত হওয়া তথা মৃত্যু হওয়া এবং জাতি বিলুপ্ত হওয়ার নিয়ম কানুনের মধ্যে বিরাট মিল রয়েছে। উভয়টি বিভিন্ন অনুঘটকের সংমিশ্রণ (Permutation Combination) এর মাধ্যমে সংঘটিত হয়। আর সেটি হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ ব্যক্তির সমষ্টিই জাতি।

মৃত্যুর সময় ও কারণের ব্যাপারে হাদীস

তথ্য-১

হযরত আবু খোজামা তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। আমি একদিন রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞাসা করলাম আমরা যে মন্ত্র পাঠ করে থাকি, ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করে থাকি বা বিভিন্ন উপায়ে আমরা যে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে থাকি, তা কি ফলাফলের কিছু প্রতিরোধ করতে পারে? হুজুর বললেন, তোমাদের ঐ সকল চেষ্টাও আল্লাহ (নির্ধারিত) প্রাকৃতিক আইনের অন্তর্গত। (আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা : হাদীসখানীতে দেখা যায় একজন সাহাবী রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞাসা করেছেন, তারা রোগ হলে ঔষধ দিয়ে চিকিৎসা করে বা অন্য ধরনের বিপদ আসলে তা হতে আত্মরক্ষার (জীবন বাঁচানোর) বিভিন্ন চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু ঐ ঔষধ বা চেষ্টা, ঐ রোগ বা বিপদের ফলাফল তথা মৃত্যুকে প্রতিরোধ করতে পারে কি না?

উত্তরে রাসূল (সা.) বলেছেন, তাদের ঐ সকল প্রচেষ্টা আল্লাহ নির্ধারিত তাকদীর তথা প্রাকৃতিক আইনের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ রাসূল (সা.) বলেছেন, ঐ রোগ হলে বা ঐ বিপদে পড়লে আল্লাহ নির্ধারিত প্রাকৃতিক আইনে যে প্রতিকারের ব্যবস্থা নির্দিষ্ট আছে সে প্রতিকারের ব্যবস্থা যদি করা যায় তবে ঐ কারণে মৃত্যু না হয়ে জীবন এগিয়ে যেতে থাকবে। আর যদি তা না করা যায় তবে ঐ সময়ে মানুষের মৃত্যু হবে।

তথ্য-২

ক. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন– রাসূল (সা.) বলেছেন, আল্লাহ এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেননি যার ঔষধ সৃষ্টি করেননি। (বুখারী,মুসলিম)

খ. হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন– রাসূল সা. বলেছেন, সকল রোগের জন্যে চিকিৎসা (ঔষধ) আছে। যখন সঠিক ঔষধ রোগের জন্যে প্রয়োগ করা হয় তখন রুগী আল্লাহর ইচ্ছায় সেরে উঠে। (মুসলিম)

গ. উসমান ইবনে শারীক (রা.) বলেন, একদিন আমি রাসূল (সা.) এর সাথে ছিলাম। তখন কিছু আরব এসে রাসূল সা. কে জিজ্ঞাসা করল 'হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি রোগের জন্য ঔষধ গ্রহণ করব?' উত্তরে রাসূল (সা.) বললেন, 'হে আল্লাহর বান্দারা, তোমরা ঔষধ গ্রহণ করবে। আল্লাহ এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেননি যার ঔষধ সৃষ্টি করেননি, শুধু একটি রোগ ব্যতীত।' তারা জিজ্ঞাসা করল, সেটি কী? তিনি বললেন, সেটি হল বার্ধক্য।

(আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)

ঘ. যায়েদ ইবনে আসলাম (রা.) বলেন, রাসূল সা. এর সময় এক ব্যক্তি আহত হয় এবং তার ক্ষতে পঁচন ধরে। রাসূল সা. লোকটির

চিকিৎসার জন্যে বনি আনসার গোত্র থেকে দুজন ডাক্তারকে ডেকে পাঠান। তারা আসলে রাসূল (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে কে অপেক্ষাকৃত ভালো চিকিৎসক? তারা উত্তরে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল (সা.) চিকিৎসায় কি ভালো-খারাপ আছে?' যায়েদ রা. বলেন, রাসূল (সা.) বললেন- 'যিনি রোগ পাঠিয়েছেন তিনি ঔষধও পাঠিয়েছেন'। (মুয়াত্তা)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা

রোগ, ঔষধ, চিকিৎসা নেয়া বা না নেয়া, ভালো-খারাপ ডাক্তার ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কিত রাসূল (সা.) এর উল্লেখিত হাদীস সমূহ থেকে জানা ও বুঝা যায়- আল্লাহ প্রত্যেক রোগের সাথে তার ঔষধও সৃষ্টি করেছেন। আর একটি রোগ, কোন ঔষধ কী মাত্রায় প্রয়োগ করলে নিরাময় হবে তা আল্লাহ নির্ধারিত করে, চিকিৎসার প্রাকৃতিক আইনে তথা চিকিৎসার তাকদীরে অন্তর্ভুক্ত করে রেখেছেন। ডাক্তার যদি নির্ভুলভাবে রোগ নির্ণয় (Diagnosis) করে সঠিক ঔষধটি প্রয়োজনীয় মাত্রায় প্রয়োগ করতে পারে, তবে রোগ অবশ্যই নিরাময় হবে। যে ডাক্তার ঐ কাজগুলো যত নির্ভুলভাবে করতে পারবে সে তত ভাল ডাক্তার হবে। তাহলে এ চারখানি হাদীস থেকেও বুঝা যায় যে, জীবন হরণকারী রোগের জন্যে আল্লাহর তৈরী করে রাখা প্রাকৃতিক আইনে যে ঔষধের ব্যবস্থা আছে তা যদি সঠিকভাবে প্রয়োগ করা যায় তবে মৃত্যু না হয়ে মানুষের জীবন নির্দিষ্ট শেষ সীমার দিকে এগিয়ে যেতে থাকবে। আর তা না হলে ঐ রোগের দ্বারা ঐসময়ে ব্যক্তির জীবনের অবসান তথা মৃত্যু হবে।

মৃত্যুর সময় ও কারণ সম্বন্ধে ইসলামের চূড়ান্ত রায়

কুরআন হাদীস ও বাস্তবতার (ডাক্তারী বিদ্যার) উল্লেখিত তথ্যের আলোকে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, আল্লাহর তৈরী করে রাখা প্রাকৃতিক আইনে (তাক্বদীর) বয়ঃবৃদ্ধিতার নিয়ম অনুযায়ী মানুষের আয়ুর একটি নির্দিষ্ট শেষ সীমা আছে যা কোন মানুষ কোনক্রমেই অতিক্রম করতে পারবে না। ঐ সময়ে কেউ পৌঁছে গেলে তাকে অবশ্যই মৃত্যুবরণ করতে হবে। তবে সকল রোগ-ব্যাধি ও বিপদ-আপদ আল্লাহর তৈরী প্রাকৃতিক আইনে থাকা বিধি-বিধান অনুযায়ী যথাযথভাবে মোকাবেলা করে ঐ শেষ

সীমা পর্যন্ত পৌঁছা প্রায় অসম্ভব। আয়ুর ঐ শেষ সীমার মধ্যে, রোগ-ব্যাধি, বিপদ-আপদ, দুর্ঘটনা, চিকিৎসা ইত্যাদি অসংখ্য অনুঘটকের (Factor) সংমিশ্রণের (Permutation Combination) ভিত্তিতে মানুষের মৃত্যুর অসংখ্য অন্তর্বর্তী অবস্থান আছে। জীবন হরণকারী রোগ, দুর্ঘটনা ইত্যাদি ঘটলে, আল্লাহর তৈরী প্রাকৃতিক আইনের বিধান অনুযায়ী যদি তা যথাযথভাবে মোকাবেলা করা যায় তবে আয়ুর শেষ সীমার দিকে জীবন অগ্রসর হতে থাকবে। আর তা না হলে ঐ অন্তর্বর্তী সময়ে জীবনের অবসান হবে তথা মৃত্যু ঘটবে।

মৃত্যুর নির্ধারিত সময় পরিবর্তন করা সম্ভব কিনা?

বিভিন্ন অনুঘটকের সংমিশ্রনের মাধ্যমে আল্লাহর তৈরী প্রাকৃতিক আইনে মৃত্যুর যে অবস্থান নির্দিষ্ট করা আছে মানুষের পক্ষে তা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। তবে মহান আল্লাহ তাঁর নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে তা পারেন। আর আল্লাহ তা করেন কোন অনুঘটকের কার্যকারিতা পরিবর্তন করে দেয়ার মাধ্যমে। আল্লাহ ঐ নির্বাহী আদেশ দেন (কুন) শব্দের মাধ্যমে। যেমন, জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে কেউ পড়ে গেলে বা কাউকে ফেলে দেয়া হলে তার মৃত্যু অবধারিত। কিন্তু ইব্রাহীম (আ.) কে যখন জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে ফেলে দেওয়া হল তখন আল্লাহ তায়ালা ঐ আগুনের প্রতি নিম্নোক্তভাবে তাঁর নির্বাহী আদেশ প্রয়োগ করলেন-

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ

অর্থ: আমি বললাম, "হে আগুন, শান্তিদায়ক ঠাণ্ডা হয়ে যাও ইব্রাহীমের জন্যে"। (২১,আম্বিয়া ঃ ৬৯)

আল্লাহর এই আদেশের সাথে সাথে আগুনের দাহ্যক্ষমতা চলে যায় এবং তা ইব্রাহীম (আ.) এর জন্যে শান্তিদায়ক ঠাণ্ডা তথা এয়ার কন্ডিশানে পরিবর্তিত হয়ে যায়। তবে নিজের তৈরী বিধিবিধান বা আইন নিজে ভংগ করা কোন ভাল শাসকের পরিচয় বহন করে না। আল্লাহ হলেন সবচেয়ে ভাল শাসক। তাই নিজের তৈরী আইন তিনি সহসা ভাংগেন না। মানব সভ্যতার কল্যাণের জন্যে বিশেষভাবে দরকার হলে শুধু তিনি তা ভাংগেন বা পরিবর্তন করেন।

আয়ু বৃদ্ধি হওয়ার জন্যে মানুষ যা করতে পারে

আয়ু বৃদ্ধি হওয়ার জন্যে মানুষ নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অবলম্বন করতে পারে–

১. আল্লাহর তৈরী প্রাকৃতিক আইনে জীবন হরণকারী বিষয় সমূহ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করা

২. জীবন হরণকারী বিষয় ঘটলে প্রাকৃতিক আইনে থাকা পদ্ধতি অনুযায়ী যথাযথভাবে তার চিকিৎসা করা।

৩. যে সকল জীবন হরণকারী বিষয়ের চিকিৎসা এখনো আবিষ্কার হয়নি তা নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাওয়া।

৪. আল্লাহর নিকট দোয়া করা যেন তিনি–
   - ক. জীবন হরণকারী বিষয় থেকে দূরে থাকতে সহায়তা করেন।
   - খ. জীবন হরণকারী বিষয় ঘটলে তার যথাযথ চিকিৎসা হওয়ার ব্যপারে সহায়তা করেন।
   - গ. জীবন হরণকারী বিষয়ের কার্যকারিতা পরিবর্তন করে দিয়ে মৃত্যু হতে না দেন।
   - ঘ. অথর্ব হয়ে যাওয়ার আগে মৃত্যু দেন।

শেষ কথা

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ, আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে আমার পক্ষে যা জানা ও বুঝা সম্ভব হয়েছে তা লিখেছি। আপনার নিকট আরো তথ্য থাকতে পারে। দয়া করে আমাকে তা জানালে এবং সঠিক হলে পরবর্তী সংস্করণে তা ছাপানো হবে ইনশাআল্লাহ। আশা করি বইটি মৃত্যুর সময় ও কারণ সম্বন্ধে সমাজে উপস্থিত থাকা ব্যাপক ভুল ধারণা উৎপাটন করতে সহায়ক হবে। আর এর মাধ্যমে মুসলিম জাতি যেমন দীর্ঘায়ু হয়ে সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীলভাবে জীবন কাটাতে পারবে, অন্যদেরও তেমনি পথ দেখাতে পারবে। ভুল-ভ্রান্তি ধরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ রেখে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি।

সমাপ্ত

লেখকের বইসমূহ

বের হয়েছে–

❑ পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী–

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য
২. নবী রাসূল আ. প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁদের সঠিক অনুসরণের মাপকাঠি
৩. নামাজ কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মুমিনের ১নং কাজ এবং শয়তানের ১ নং কাজ
৫. ইবাদাত কবুলের শর্তসমূহ
৬. বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ ছাড়া কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. ইসলামের মৌলিক বিষয় ও গুরুত্বপূর্ণ হাদীস নির্ণয়ের সহজতম উপায়
৯. ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করলে গুনাহ হবে কি?
১০. আল-কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি?
১২. ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলা
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. মু'মিন ও কাফিরের সংজ্ঞা এবং শ্রেণী বিভাগ
১৫. 'ঈমান থাকলেই বেহেশত পাওয়া যাবে' বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা
১৬. শাফায়াতের দ্বারা কবীরা গুনাহ ও দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. 'তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত' – কথাটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি- প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. হাদীসশাস্ত্র অনুযায়ী, সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন দোযখ থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্যে শিরক বা কুফরী নয় কি?
২২. গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ
২৩. অমুসলিম সমাজ বা পরিবারে মানুষের অজানা মু'মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি আছে কিনা ?
২৪. 'আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয়' তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিকির - (প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র)
২৬. কুরআনের তাফসীর করা এবং তাফসীর পড়ে সঠিক জ্ঞান অর্জনের মূলনীতি
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ' কথাটি কি সঠিক?